কালের কণ্ঠ

আপডেট : ১ ডিসেম্বর, ২০১৮ ২২:১১

প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড গঠন করা প্রয়োজন

মাছুম বিল্লাহ

২৬ নভেম্বর শেষ হলো শিশুদের জীবনের প্রথম পাবলিক পরীক্ষা পিইসি ২০১৮। এবার দশমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথা ৩১ লাখ ৯৬ হাজার শিক্ষার্থী; কিন্তু প্রথম দিনেই এক লাখ ৬০ হাজার পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল। ৪১ লাখ শিক্ষার্থী ২০১৪ সালে ভর্তি হয়েছিল প্রথম শ্রেণিতে, অর্থাৎ ১০ লাখ শিক্ষার্থী নেই প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত আসতে। ২০০৯ সালে প্রথমবারের মতো প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ২২ লাখ শিশু। এ দশকে এই স্তরে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ১০ লাখ। ২০১০ সাল থেকে এই পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মাদরাসার শিশু শিক্ষার্থীদের ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা। তবে দেশের সবচেয়ে বড় এই পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনার জন্য কোনো শিক্ষা বোর্ড নেই। অবশ্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ১০ বছর ধরে প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড নামে পৃথক একটি শিক্ষা বোর্ড গঠনের কথা বলে আসছে; কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি এখনো। বোর্ড গঠনের প্রধান অন্তরায় নাকি অর্থনৈতিক—এ দাবি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সভাপতির। একটি বোর্ড গঠন করার জন্য জনবল নিয়োগ ও অফিস ব্যবস্থাপনায় অনেক অর্থের প্রয়োজন, যা এ মন্ত্রণালয়ের নেই। সম্ভাব্য ব্যয় ও জনবল কাঠামোর খসড়া তৈরির জন্য জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিকে দায়িত্ব দিয়েছে মন্ত্রণালয়। এ বছর সাত হাজার ৪১০টি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১২টি কেন্দ্র বিদেশে অবস্থিত। ভয়, শঙ্কা, মানসিক দুর্বলতা ও অজানা আতঙ্ক নিয়ে শিশুরা এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। তাই শিক্ষাবিদরা এই পরীক্ষার বিপক্ষে। আমি নিজেও চাই না এই শিশুদের জন্য এ ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি। কিন্তু সরকারের নিজস্ব কিছু যুক্তি আছে এবং বাণিজ্যিক কিছু কারণে সম্ভবত পরীক্ষাটি ১০ বছর ধরে চলছে। এত বড় একটি আয়োজন শিক্ষা বোর্ডের মতো বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ছাড়া পরিচালনা করা হচ্ছে।

প্রতিবছর এসএসসি কিংবা এইচএসসি স্তরে ১০ লাখ থেকে ১৩ লাখ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। এই পরীক্ষা নিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৯টি শিক্ষা বোর্ড আছে। এ ছাড়া মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষার জন্য রয়েছে আলাদা আরো দুটি বোর্ড। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা পরিচালনা করা হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের মাধ্যমে। এই পর্যায়ে কোনো আলাদা বোর্ড না থাকায় সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, ফলাফল প্রদানসহ পরীক্ষাসংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রমে সমন্বয়হীনতা দেখা দেয়। প্রতিবছরের শেষ দুটি মাস শিক্ষা কর্মকর্তারা বিনা মূল্যের পাঠ্য বই বিতরণ এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এরিয়ার টার্গেট অনুযায়ী ভর্তি কার্যক্রমে ব্যস্ত থাকেন। একই সময় এই পরীক্ষার কার্যক্রম পরিচালনা করতে তাঁদের হিমশিম খেতে হয়।

প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি দিন দিনই বাড়ছে। অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরের মাধ্যমে এ দুটি পর্যায়ের শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা এবং পাঠক্রম পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ছে। প্রশাসনিক শৃঙ্খলা এবং নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার দায়িত্ব অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরের। পাঠক্রম তৈরি, পরীক্ষা পরিচালনা ও সনদ বিতরণ তাঁদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকেও প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের বিষয়টিতে জোর দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক স্তরের সবচেয়ে বড় এই পাবলিক পরীক্ষার ফল তৈরিতেও গত দুই বছরে অনিয়মের ব্যাপক অভিযোগ উঠেছে। বর্তমানে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার উত্তরপত্র সংশ্লিষ্ট জেলায় পাঠিয়ে পরীক্ষা করা হয়। ফলাফলের তালিকা তৈরি হয় উপজেলা শিক্ষা অফিসে। তবে বৃত্তি পাওয়ার আশায় ভালো ফলের জন্য উত্তরপত্রে নম্বর বেশি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে গত দুই বছর পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর। নিজের প্রতিষ্ঠানে বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থীকে বৃত্তি পাইয়ে দিতে প্রধান শিক্ষকদের অনেকে মরিয়া হয়ে ঘুষও দিয়ে থাকেন। এ কী শিক্ষা দিচ্ছে শিশুদের শিক্ষার এই উষালগ্নে! এ কারণে এ বছর এক উপজেলার খাতা অন্য উপজেলায় মূল্যায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটি প্রশংসার পদক্ষেপ বলতে হবে।

এবার পরীক্ষার ফল নির্বাচনের আগেই প্রকাশ করা হবে বলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী বলেছেন। তিনি আরো বলেন যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রতিটি জেলার পরীক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য ভিজিল্যান্স টিম গঠন করা হয়েছে। কেন্দ্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

গত বছর সব কটি বিষয়ের বহু নির্বাচনী প্রশ্ন ফাঁস হওয়ায় এবারের সমাপনীতে তা বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে পরীক্ষার্থীদের ছয়টি বিষয়ের প্রতিটিতে ১০০ নম্বর করে মোট ৬০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়েছে। পরীক্ষার প্রশ্নের নিরাপাত্তায় এবার শিক্ষা বোর্ডগুলোর অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হয়েছে। ফলে এবার প্রশ্নের নিরাপত্তায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। দেশের অভ্যন্তরে দুর্গম এলাকা হিসেবে চিহ্নিত ২০৪টি কেন্দ্রে বিশেষ ব্যবস্থায় প্রশ্নপত্র পাঠানো হয়েছিল। দেশের ৬৪টি জেলাকে আটটি অঞ্চলে ভাগ করে আট সেট প্রশ্নে সমাপনী পরীক্ষা নেওয়া হয়। কোন জেলা কোন অঞ্চলে থাকবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের শীর্ষ কর্মকর্তারা গোপনীয়তার সঙ্গে তা নির্ধারণ করেছেন। আট অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত প্রশ্নপত্র পাঠানো হলেও কোনো জেলার প্রশ্ন ফাঁস হলে শুধু ওই জেলার শিক্ষার্থীই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ পাশের জেলাটি কোন অঞ্চলে পড়ছে সেট প্রশ্নের মধ্যে বাছাই করে আটটি সেট ছাপানো হয়েছে। লটারির মাধ্যমে আটটি অঞ্চলে আটটি করে জেলাকে নির্ধারণ করা হয়। প্রতিটি পরীক্ষার দিন এসব জেলার হিসাব পাল্টে যাবে। সে অনুযায়ী অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নের সেট নির্দিষ্ট জেলায় পাঠানো হয়েছিল।

এবার এই প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় নতুন উদ্বেগ হিসেবে দেখা দিয়েছে ভুয়া পরীক্ষার্থী। এই ভুয়া পরীক্ষার্থীরা কয়েক ধাপ উঁচু ক্লাসের শিক্ষার্থী। মূল পরীক্ষার্থীদের নামে পরীক্ষায় বসা এই অপকর্মকারীর সংখ্যা পিইসির চেয়ে ইবতেদায়িতে ছিল বেশি। লালমনিরহাট, মাদারীপুর ও শ্রীমঙ্গলে আটজনসহ মোট ১৯ জন ভুয়া পরীক্ষার্থী ধরা পড়েছে। তারা শিশু হওয়ায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি তাদের বিরুদ্ধে। মূল পরীক্ষার্থীকে অনুপস্থিত দেখিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষকদের যোগসাজশেই এই ভুয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। কারণ যে স্কুল বা মাদরাসা থেকে পরীক্ষা দেবে সেই প্রতিষ্ঠান বা কেন্দ্রের শিক্ষকদের যোগসাজশ ছাড়া কোনোভাবেই ভুয়া পরীক্ষার্থীদের হলে ঢোকানো সম্ভব নয়। বিষয়টি অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে দেখা উচিত। কারণ জীবনের প্রথম পরীক্ষায়ই যদি আমরা শিক্ষার্থীদের এত বড় চুরি বিদ্যা শেখাই, তাহলে তারা ভবিষ্যতে কী করবে, তা বোঝাই যাচ্ছে।

প্রতিবছরই প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা অনুপস্থিত থাকছে। এর অনেক কারণও আছে। গ্রাম আর শহরে পড়াশোনার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। একটা অসম শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে শিশুরা বেড়ে উঠছে। এ রকম একটা পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিতে গিয়ে শিশুরা ভয় পায়। প্রতিবছরই পরীক্ষার আগে অনেক শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ কারণেও অনেকে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে না। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, ‘পিএসসি পরীক্ষা আমার কাছে খুবই অপ্রয়োজনীয় একটি পরীক্ষা মনে হয়।

শিশুদের কাছে এটা একটা বোঝার মতো। এই পরীক্ষা নিয়ে কার স্বার্থ যে রক্ষা হচ্ছে কে জানে। তবে একমাত্র নোটবুক আর টিউশন বাণিজ্য যারা করছে তাদের ছাড়া কারো স্বার্থরক্ষা হওয়ার কথা নয়। শিশুরা তোতাপাখির মতো পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষার হলে বসছে। এ ধরনের পরীক্ষার কোনো অর্থ নেই। আদর্শিকভাবে আমি এই পরীক্ষার ঘোর বিরোধী।' তবে এই পরীক্ষা চলুক আর না চলুক, এত বড় বিশাল বহরের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ শিক্ষা বোর্ড থাকা প্রয়োজন। শিশুদের জন্য সামেটিভ অ্যাসেসমেন্টের পরিবর্তে ফরমেটিভ অ্যাসেসমেন্ট চালু করা প্রয়োজন। মূল্যায়ন যেভাবেই করা হোক না কেন, একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত, যাকে আমরা শিক্ষা বোর্ড বা যে নামেই ডাকি না কেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আর মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের দ্বারা শিশুদের জাতীয়ভাবে মূল্যায়ন করার পদ্ধতি কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।

লেখক : ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচিত কর্মরত সাবেক ক্যাডেট কলেজ ও রাজউক কলেজ শিক্ষক

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com